

ପ୍ରେମ

ସମ୍ପାଦନା/ଅତୀନ ବଞ୍ଚେପାଠ୍ୟାୟ

প্রকাশক/গুনে শীল, ৬ কামার পাড়া লেন, বরাহনগর কলিকাতা-৩৬

মুদ্রক/“ভৈরব মুদ্রণ” ৪৫, মানিক বোস ট্রাস্ট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ/১লা বৈশাখ, ১৩৫৯

সহযোগীতার উদযাপন রায়

প্রচ্ছদ শিল্পী/অঞ্জন ঘোষ

প্রথমসূচী

* গল্প *

সমরেশ বসু	১
বিমল কর	৩৫
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	৬২
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	৮৯
নলিনী বেরা	১১১
আবুল বাশার	১৪০
শিবতোষ ঘোষ	১৫৯
সমরেশ মজুমদার	১৭২

* কবিতা *

সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৯৩
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯৫
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	১৯৬
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়	১৯৭
পূর্ণেন্দু পত্রী	১৯৮
সাধনা মুখোপাধ্যায়	১৯৯
রাখাল বিশ্বাস	২০০
কৃষ্ণা বসু	২০১
শ্যামলকান্তি দাশ	২০২
মলয় সিংহ	২০৪
প্রমোদ বসু	২০৫
রতনভদ্র ষাটী	২০৬
জয় গোস্বামী	২০৭
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়	২০৮

উদয়ারণ রায়	২১০
বিশ্বজিৎ পাণ্ডা	২১২
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস	২১৩
তাপস মহাপাত্র	২১৪

* প্রবন্ধ *

শুভকর মুখোপাধ্যায়	২১৭
চিত্রা দেব	২২২

* ছবি *

সুত্রত গঙ্গোপাধ্যায়
কুমোন্দু চাকী
অঞ্জন ঘোষ
সুত্রত মুখোপাধ্যায়
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

ଗଞ୍ଜା

। আদি ।

“আমি অস্বীকার করছি, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা...”

সুপর্ণা ছুঁহাত বাড়িয়ে শৈবালের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরলো,
“দোহাই তোমাব, বুড়ো বাবা-ঠাকুর্দার মতো জ্ঞানের বাক্য শুনিও না।
কোথায় একটা মজার গল্প বলতে এলুম, শুনে এন্জয় করবে। তা না,
সেলফ্ ক্রিটিসিজম শুরু করে দিলে।”

“তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মধু।” শৈবাল সুপর্ণার ডাক নামে
ডেকে, ওর নিখুঁত ম্যানিকিওর করা পারফিউমের নেশা ধরানো
গন্ধমাখা কোমল ফরসা হাত দুটি মুখ থেকে টেনে বুকে রাখল,
“তোমার মজার গল্পের নায়ক নায়িকা, অরিন্দম আর কৃষ্ণা সম্পর্কে তা
হলে লোভের কথা বললে কেন? আর ওদের করুণা করার কথাই
বা তোমার মনে এলো কেন?”

সুপর্ণা ঘরের বন্ধ দরজাটার দিকে একবার দেখে নিল। কারণ
শৈবাল যে কেবল ওর হাতছোটো টেনে বুকের ওপর নিল, তা নয়।
ওকেও টেবিলের পাশ দিয়ে বুকের অনেকটা কাছে টেনে নিল। ঈষৎ
বাধা দেবার চেষ্টা করলো। ফলে ফবুজ বনে লাল ফুল ছাপানো
পিওর সিল্কের শাড়ির আঁচল খসলো। শাড়ির সঙ্গে অভিন্ন রঙের
মেশানো জামায়, অনন্ত উদ্ভিন্ন বুকের একদিক উদাস। অতি অনুজ্জল
ওষ্ঠরঞ্জনী মাখা পুষ্ট ঠোঁট টিপে, ওর স্বাভাবিক সরু ক্রকুটি চোখে
শৈবালকে হানলো। কপালের সামনে, ছাঁটাই করা নয়ম কালো
চুলের গোছা এসে পড়েছে প্রায় ওর দীর্ঘায়ত কালো চোখের ওপর।
“কী করছো? এটা তো তোমার অফিস-ঘর বলেই জানি।
দরজাটাও খোলা।”

“ভুল কথা একটাও বলোনি।” শৈবাল ওর স্বকমকে দাঁতে হেসে সুপর্ণাকে কোনো অবকাশ না দিয়েই ঝটিতি প্রায় বুকের সংলগ্ন করলো, “কেবল ভুলে গেছ, দরজার বাইরে একজন বেয়ারা আছে। আর দরজার বাইরে, লাল বাতিটার সুইচ আমি আগেই অন করে দিয়েছি। যাকে বলে রক্ত-চক্ষুর নিবেদ-সংকেত।”

সুপর্ণা দেখল, ওর বুকে ঠেকেছে শৈবালের কপাল। পোশাকে-আশাকে আর বাকচাতুর্যে যতো আধুনিকই হোক, বুকের স্পর্শে একটা শিহরিত লজ্জাকে চাপা দায়। বন্ধ ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকলেও কোনরকমে শৈবালের হাত থেকে, একটা হাত ছাড়িয়ে, ওর মাথাটা সরিয়ে দিল। ঢেউ খেলানো চুলের মুঠি আলগা করে ধরলো। মুখে ততক্ষণে লেগে গিয়েছে রক্তচ্ছটা, “মতলবটা কি তোমার বল দিকিনি? আমি তো তোমাকে ওরকম প্রভোক করতে চাইনি। তবে কেন....”

“আমার ইংরেজি বাঙলা, ছই-ই খুব খারাপ।” শৈবাল চেয়ার থেকে মুখ তুলে সুপর্ণার লজ্জা আর অস্বস্তিভরা মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। “আসলে, তুমি তো সমস্ত দিক দিয়ে আমার চোখে মূর্তিমতী প্রোভোকেটর। কিন্তু ঘরে ঢুকে হুক্‌ধার পরেই তুমি আমাকে বলেছিলে, আমার মধ্যে তুমি অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা দেখতে পাও না। ...আহা, না না, আমি অবিশিষ্ট ও কথাটার জবাব দিতে বা শোধ নিতেই, এসব কিছু করছিনে। তুমি ভালোই জানো, অরিন্দমের পাগলা দাপানি আমার সত্যি নেই, কারণ আমার স্থান কাল পাত্রী নিয়ে হারানোর ভয় আর ছটকটানি নেই। অকিসের কামরায়, এমন অসময়ে, তোমার সত্তা লাগিয়ে আসা ঠোটের রঙ চুবে সেবো, এতোটা কাণ্ডজ্ঞানহীনও আমি নই। তবু যে কেন তোমাকে কাছে টেনে নিলুম—মানে—”

শৈবাল কথাটার শেষ খুঁজে পেলো না। মুখের হাসিতে একটা অসহায় অভিযুক্তি। ওর হাত থেকে মুক্ত হয়ে, সুপর্ণা হুঁহাত সরে

দাঁড়ালো। ঘাড় ঝটকা দিয়ে কপালের চুলের গুচ্ছ সরাসরে গিয়ে, নতুন করে আর এক গুচ্ছ চুল কপালে এসে পড়লো। বয়েজ কাট থেকে কয়েক ইঞ্চি বড় চুল, ঘাড়ের কাছে বন্ধনহীন অব্যাহত হয়ে যেন ফুঁসছে। ঘাড় ওর সোজা হল না। নুন্ন কাজলটানা আয়ত কালো চোখে জ্রুকুটি দৃষ্টি। সবুজবনে লাল ফুল ছাপানো রেশমী শাড়ির আঁচল টানল বুকে। কিন্তু যতটা টানলো, ততটা খসলো। টানা চোখ, টিকলো নাক, ঈষৎপুষ্ট ঠোঁট, প্রায় করসা রঙ, সব মিলিয়ে ওকে রূপসী বলা যাবে কি না সন্দেহ। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সমস্ত-রকম রমণীয় সৌন্দর্যই ওর আছে। স্বাস্থ্য আছে দীপ্তি। বাড়তি মেদ বলে কিছুই নেই, অথচ প্রায় দীর্ঘ শরীরের গঠন নিখুঁত। কাঁখে ঝুলছে কাজের মেয়েদের মতোই বড় ব্যাগ। বাঁ হাতে ঘড়ি। কানে ছোটো ছোটো মুক্তো। বয়েসটা বাড়িয়ে বলতে ভালবাসে। কারণ জানে, ওর বয়েসটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে হলে ওকে নিয়েই ঘামাতে হয়। চকিবশটাকে আটাশ বললেও, আটাশে টসটসই করে। কিন্তু এখন ওর ঘাড় বাঁকানো জ্রুকুটি চোখে যেন খুবই বিরক্তি, উদ্বেজনা আর অভিযোগ “মানেটা বলো, তবু কেন ওরকম কাছে টেনে নিলে?”

“যে-কথাটার জবাব কোনদিন দিতে পারিনি, সেই কথাটাই তুমি জিজ্ঞেস কর।” শৈবাল ওর ঘুরন্ত চেয়ারে একটু বাঁ দিকে টাল খেলো। “ভোমার সঙ্গে যা সব করি, তাকে অসম্ভ্যতা বলে কিনা জানিনে। তবে এখন তুমি আমাকে অসম্ভ্য বলোনি। যে-শব্দটা সত্যি প্রোভোকেটিং। আসলে কী জানো রিন্টি (সুপর্ণার ডাক নাম) এক এক সময় কেমন হেলপলেস হয়ে যাই। অসহায়কে করুণা কর। দয়া করে বস। অরিন্দম আর কৃষ্ণার মজার কিস্তাটা শোনা যাক।”

বজ্রিণ বছরের শৈবাল। অধিকাংশ বাঙালীর মতোই শ্রাহ্মণ রঙ। বড় চোখ ছোটো চুলুচুলু। বুকের দীপ্তিটাকে শানিয়ে রাখার

দরকার করে না। নিজে কে কোনো দিক থেকেই অসাধারণ দেখানো বা জানানো লজ্জার বিষয় বলে মনে করে। ভালো কোম্পানির একজন উপযুক্ত একজিকিউটিভ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সহজেই। প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ ডিরেকটদের আস্থা-ভাজন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো। অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে আছে একটা অনায়াস মেলামেশা। অথচ এর সমস্ত কিছু মধ্যোই কোথায় যে একটা দূরত্ব আছে, তা সহজে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু অপরকে সেটা অনুভব করতেই হয়। তবে অহংকারি কেউ বলে না ও কে। মাঝারি লম্বা। সাদা ফুল স্লিভ শার্ট আর ট্রাউজার ওর প্রিয়। অপ্রিয় হল, রাষ্ট্রীয় ভাষায় যাকে বলে কণ্ঠ-লেগুটি। রোমান্টিক চেহারার বাঙালী যুবক বলতে যা বোঝায়, একরকম তাই বলা যায়। কিন্তু এখন ও সুপর্ণার সঙ্গে যা-ই করে থাকুক, আসলে বত্রিশ বছর বয়সের তুলনায় ওকে শান্ত আর চিন্তাশীল বলে মনে হয়।

সুপর্ণা বোধহয় ভেবেছিল, আরও কিছু বলবে। কিন্তু শৈবালের কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে কথাগুলো শুনে ওর ভ্রুকুটি চোখে হাসির ঝিলিক হানলো। এবং ঠোট ফুলিয়ে মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করলো, “অসভ্য!”

“উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে।” শৈবাল যেন দাঁড়াবারই উদ্যোগ করলো।

সুপর্ণা বসে পড়লো মুখোমুখি চেয়ারে, “কারণ আবার অসহায় হয়ে উঠছো, না? কিন্তু ঐ যে কী সব সেলফ্ ক্রিটিসিজম শুরু করেছিলে, আমরা এ যুগের ছেলেমেয়েরা...?”

“সেটা আর বলতে দিলে কোথায়?” শৈবাল টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে দেখালে। হুঁচোখে জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সুপর্ণার অনুমতি প্রার্থনা।

সুপর্ণা ঠোটের ভঙ্গি করে, আবার ভ্রুকুটি চোখে তাকালো, “যেন বারণ করলেই শুনবে।”

“অথচ শুনলে কত ভাল হয়।” শৈবাল প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরলো। টেবিল থেকে গ্যাস লাইটারটা ছেলে নিল। আলিয়ে সিগারেট ধরাল, “ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার ঘটনা বলতে আরম্ভ করেছিলে। আমি তোমাকে বসতে বলেছিলুম। তখন তোমার সেই অ্যালিগেশনটা শোনা গেল, অরিন্দমের পাগলা দাপানিটা তুমি আমার মধ্যে দেখতে পাও না। জানতুম, কথাটা, তুমি মন থেকে বলোনি। তাই হেসে আবার বলেছিলুম, বস, তারপরে বল। কিন্তু তুমি বসোনি। আমাকে মিথ্যেই একটু খোঁচা দিয়ে, তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সমালোচনা শুরু করে দিলে। বললে ওরা নির্ভজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। একমাত্র তখনই আমি এদের সমর্থনে ঐ কথাটা বলেছিলুম, আমি অস্বীকার করছিলাম, আমরা এশুগের ছেলেমেয়েরা...”

শৈবাল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসলো। সুপর্ণা কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে, পাশের চেয়ারে রাখলো। ঘাড় বাঁকিয়ে গালে হাত দিয়ে তাকালো। ওর ঠোঁটের হাসিতে বক্রতা, “কথাটা শেষ কর।”

“স্বার্থপর মানে আমরা এ শুগের ছেলেমেয়েরা।” শৈবাল হাসলো, “স্বীকারোক্তিটা তুমি আমার মুখে আগেও শুনেছো। তাই কথাটা শোনবার আগেই তোমার ঠোঁট বেঁকে উঠেছে। অরিন্দম আর কৃষ্ণাকে দিয়ে কথাটা হয় তো আরো ভাল করেই প্রমাণ করা যায়। আসলে আমার বক্তব্য ছিল, অস্বীকার করবো না, আমরা স্বার্থপর। কিন্তু যারা এই অভিযোগটা করেন, তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখতেন, কেন আমরা স্বার্থপর হয়েছি, তা হলে বুঝতে পারতেন, এ ভূমি আর বৃক্ষ সবই তাঁদের হাতে তৈরি। সেজন্য জেনারেশন গ্যাপ্ কথাটায় তাঁদের খুব সুবিধে করে দেয়। কিন্তু কী দেখছি আমরা? স্বার্থপর বলে কি, বোকা কিংবা উল্লুক হয়ে গেছি? অথবা অন্ধ? কিছুই বুঝিনে? আমাদের এই শুগটার ছেলেমেয়েদের

বিরুদ্ধে ধাঁদের স্বার্থপরতার অভিযোগ, তাঁরা সবাই পরার্থপর ? এ সময়ের সমস্ত চেহারাটার দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। পরার্থপর পিতৃদেবদের মালিগা.....নাহ্ রিন্টি, এসব বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। এর চেয়ে অরিন্দম আর কৃষ্ণার গল্প অনেক উপাদেয়। ও সব সেলফ্ ক্রিটিসিজম-টিজম, অল বোগাস্। লেটু আওয়ার লার্গেড প্যারেণ্ট টু টেল দোজ স্টোরিজ। তারপরে অরিন্দমটা কী করলো ? ঘরের ভেতর দরজার আড়ালে যেতে না যেতেই, কৃষ্ণাকে চুমো খেলো তারপরেই ছইক্ষির বোতলের মুখটা খুলে ফেলল বাসুদেবের সামনেই....”

সুপর্ণা চেয়ারের পেছনে এলিয়ে পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো। অবাধ্য রেশমী শাড়ির সবুজ বনে লাল ফুল কেঁপে কেঁপে ঝরে পড়তে লাগলো। “বাসুদেব নয়, আমার সামনে। কিছুই মনে নেই তোমার। বাসুদেব তখন তালি লাগানো অফিস-ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।”

“তোমার সামনে ?” শৈবাল যেন স্বস্তিতে এলিয়ে পড়লো ওর চেয়ারে, “সেটা তবু অনেক ভালো। তুমি হলে ওদের বন্ধু। আর বাসুদেব হল তোমার বাবার অফিসের কেয়ারটেকার। তোমার চোখে ঘটনাটা একরকম। বাসুদেবের চোখে ঠেকতো আর এক রকম। অবিশ্টি তুমি অরিন্দম আর কৃষ্ণার সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, নির্লজ্জ, লোভী, নীতিজ্ঞানহীন, স্বার্থপর।”

সুপর্ণা হাসতে হাসতে, কপালের চুলের গোছা সরিয়ে দিল, “তা বলেছি, কিন্তু রেগে বলিনি। ওদের পাগলামি দেখে আমার হাসি পাত্ছিল। আর সত্যি লজ্জা করছিল, যদি বাসুদেব দেখতে পেতো ? আর কিছু না। একটা সাজানো খালি ঘর পেয়েই ওরা ছজনে ষেরকম....ছইক্ষির বোতল খোলাটা কিছু নয়। বাসুদেবই তো জল গেলাস দেবার লোক...কী ব্যাপার ? তুমি যেন আবার কিছু ভাবতে আরম্ভ করছো ?”

“আমি ?” শৈবাল চমকে সোজা হয়ে বসলো। হাসলো, “না না, কিছুই ভাবছি নে। গোটা ব্যাপারটা একেবারে প্রথম থেকেই আবার শোনা যাক। অরিন্দম অফিসে তোমার ঘরে টেলিফোন করলো। তারপর তোমাকে লাইনে পেয়ে বললো, সুপর্ণা! আমি আর কৃষ্ণা...”

সুপর্ণা ওর ঘরে পড়া রেশমী শাড়ি তুলে, বুকের জামায় গুঁজলো। ঘাড় নাড়লো, “উহু। অরিন্দম ইন্টারকমে জিঙ্কস করলে, সুপর্ণা, ছটা বাজে। তোমার কি অফিসে এখনো কাজ আছে? আমি বললুম, একটু। কেন বলো তো? অরিন্দম...”

“ধাক।” শৈবাল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লো, “ব্যাপারটা আজকের নয়। কদিন ধরেই চলছে। তার চেয়ে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। টোটাল অ্যাক্কেয়ারটার তো শুরু হু সপ্তাহের। মানে, তোমার বিশ্বাস, খাঁটি প্রেম...”

সুপর্ণা ঘাড়ে বাঁকুনি দিল। ঠোঁট বাঁকালো ঈষৎ “তোমার মতো সকলের চার বছর লাগে না। তোমার হল তুলনাহীন প্রেম।”

“সেরকম কোনো দাবী নেই।” শৈবাল সিগারেটের শেষাংশ ছাইদানিতে গুঁজে দিল “চারি চক্কের মিলনে প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেম সঞ্চারিত হইল—মানে প্রথম দর্শনেই প্রেম। এই রীতির কথা তুমি বলছো। বেশ মেনে নিলুম। তবু গোড়া থেকেই শুনি। কী খাবে বল।”

সুপর্ণা ঘাড় নাড়লো, “কিছুই না। অন্তত তোমার এই ঠাণ্ডা অফিস ঘরে না। বাইরে চল। সময়ও বেশিক্ষণ হাতে নেই। তুমি সঙ্গে আছ বলেই, বড় জোর রাত সাড়ে নটা অন্ধি বাইরে অ্যালাউড।”

সুপর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হয়েছে হ’ মাস। ডিপার্টমেন্ট মার্কেটিং। কোনো কোম্পানির এ বিভাগে চাকরি পাবার মতো শিক্ষাগত প্রস্তুতি ওর ছিল না। একেবারে অব্যবহৃত ছিল না।

কমার্চে এম-এ পাশ করে, ও যখন ভাবছিল, বেশ একটা গাল ফোলানো নামের সংস্থায়, এবং এক বিশিষ্ট অডিটরের অধীনে, একাউন্টেন্সিতে হাত পাকাবে ভবিষ্যতের কেরিয়ারের জ্ঞান, তখনই মার্কেট রিসার্চের জ্ঞান নামী কোম্পানীর বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়েছিল। অথচ দরজায় দরজায় ঘুরে ঐ সমীক্ষার কাজে ওর যাবার কথা নয়। বাবা মা আপত্তি করেছিলেন। শৈবালেরও অন্তরে সায় ছিল না। কিন্তু সুপর্ণার যুক্তির কাছে ও হার মেনেছিল। যুক্তিটা হল, ‘কোনো কাজই ছোট নয়।’ অবিশিষ্ট ফলটা শেষ পর্যন্ত খারাপ হয়নি। ইন্টারভিউ পেয়েছিল। এক ডজন মেয়ের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল। কৃষ্ণা তখন সেই দলে ছিল না। অরিন্দম সেই মার্কেটিং বিভাগের একজন ছোটখাটো অফিসার। মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্য করাটা ছিল ওর কাজ। প্রত্যেক মেয়ের প্রতিদিনের রিসার্চের রিপোর্ট দেখতেন মার্কেটিং ম্যানেজার। অরিন্দমের সঙ্গে সুপর্ণার তখন থেকেই একরকমের বন্ধুত্ব হয়েছিল। কারণ, অরিন্দমের বয়স কম। অফিসারস্বলভ আচরণ করতো না। অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের সাহায্যের ব্যাপারে, ও প্রায় সবাইকে ওর সহকর্মীর মর্যাদা দিতো। মেলামেশা করতো বন্ধুর মতো।

এক ডজন মেয়ের মধ্যে, শিকে ছিঁড়েছিল সুপর্ণার ভাগ্যে। মার্কেটিং ম্যানেজার ওর দৈনিক রিপোর্ট দেখে উৎসাহী হয়েছিলেন। নতুন করে ওর দরখাস্তটা দেখেছিলেন উন্টে-পার্টে। মার্কেটিং-এর সঙ্গে দাম-দস্তুরের হিসাব নিকাশের সম্পর্কটা বিশেষ কেউ যাচিয়ে দেখে না। সুপর্ণা দেখতো। ওর রিপোর্টেও সেটা থাকতো। এরকম একটি কাজের মানুষের দরকারও ছিল তখন। মার্কেটিং ম্যানেজার সুপর্ণাকে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, এরকম কোনো পদ ও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। সুপর্ণা কারোর সঙ্গে পরামর্শ না করেই, মার্কেটিং ম্যানেজারকে ওর সম্মতি দিয়ে দিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে সুপর্ণার সেটা একটা দৈবযোগে সৌভাগ্যের ঘটনা বলতে হয়।

অস্থায়ী মার্কেট রিসার্চের মেয়েদের কাজের মেয়াদ ছিল দু সপ্তাহের। কোম্পানীর গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় নেমে যাওয়া, এবং আরো পথ খরচা বাদ দিয়ে ওদের দৈনিক বেতন ছিল পঁচাত্তর টাকা। আধুনিক কোম্পানীগুলো বাজার সমীক্ষার জন্য ডজন ডজন ছেলে মেয়েদের স্থায়ী চাকরি দেয় না। প্রয়োজন হলেই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেয়। এসব ক্ষেত্রে মেয়েদেরই ডাক পড়ে বেশি।

সুপর্ণা ওর চাকরিতে বহাল হবার পরে, দুবার বাজার সমীক্ষার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অরিন্দম যদিও ছোটখাটো একজন অফিসার, কিন্তু সুপর্ণার সহকর্মী। অবিশি বাজার সমীক্ষার মেয়েদের নিয়ে সুপর্ণার কিছু করার ছিল না। অরিন্দমকেই ঐ বিষয়টি দেখতো হতো। দ্বিতীয় বারের সমীক্ষক মেয়েদের দলে, কৃষ্ণার আবির্ভাব।

অরিন্দম ঐ সব মেয়েদের সাহায্য করে, ভালোভাবেই কাজ গুছিয়ে নিতে পারতো। ও একজন রসিক যুবক, সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে, ওর রসিক প্রাণে প্রেমোদয় ঘটেনি। কৃষ্ণার চোখে চোখ পড়তেই, সেইটি ঘটে গেল। দু সপ্তাহের মেয়াদে, অল্প মেয়েদের থেকে আলাদা করে ও কৃষ্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো। দেখা গেল, কৃষ্ণার একই দশা। দুহু দোহা করে লীলা, সাক্ষী অসুখ্যামী। কিন্তু এসব বিষয় বেশিক্ষণ চেপে রাখা দায়। অরিন্দমের পক্ষে, অফিসে কথাটা প্রাণ খুলে বলবার মতো একজনই ছিল। সুপর্ণা। অতএব, অফিস ছুটির পরে সুপর্ণাকে বন্ধু ও তার প্রেমিকাকে দু তিনটি সন্ধ্যা কিছুক্ষণ সাইচর্চ দিতে হল। আর সব কথা শৈবালকে না শোনালে চলতো না।

কৃষ্ণাকে কি সুপর্ণার খুব ভালো লেগেছিল? দেখতে মেয়েটি খারাপ নয়। এক ধরনের আত্মরে ফুলটুসি গোছের মেয়ে। চেহারাটি ছোটখাটো হলেও, স্বাস্থ্য ভালো। ওর ইংরেজি বলার ভঙ্গিটি আকর্ষণীয়। কিন্তু বড় ডুল বলে। ওর বাবা একজন অবসর-প্রাপ্ত চটকলের লেবার অফিসার। জীবনের শেষ সঞ্চয় নাকি নাক-